৩

স্থান -- কাশীপুর, গোপাললাল শীলের বাগান
কাল -- মার্চ, ১৮৯৭

প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া স্বামীজী কয়েক দিন কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন, শিষ্য তখন প্রতিদিন সেখানে যাতায়াত করিত। স্বামীজীর দর্শনমানসে তখন বহু উৎসাহী যুবকের সেখানে ভীড় হইত। কেহ ঔৎসুক্যের বশবর্তী হইয়া, কেহ তত্ত্বান্বেষী হইয়া, কেহ বা স্বামীজীর জ্ঞান-গরিমা পরীক্ষা করিবার জন্য তখন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিত। প্রশ্নকর্তারা স্বামীজীর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত; স্বামীজীর কণ্ঠে বীণাপাণি যেন সর্বদা অবস্থান করিতেন।

কলিকাতা বড়বাজারে বহু পন্ডিতের বাস। ধনী মারোয়াড়ী বণিকগণের অন্নেই ইহারা প্রতিপালিত। স্বামীজীর সুনাম অবগত হইয়া কয়েকজন বিশিষ্ট পন্ডিত স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করিবার জন্য একদিন এই বাগানে উপস্থিত হন। শিষ্য সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল।

আগন্তুক পন্ডিতগণের সকলেই সংস্কৃতভাষায় অনর্গল কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। তাঁহারা আসিয়াই মন্ডলীপরিবেষ্টিত স্বামীজীকে সম্ভাষণ করিয়া সংস্কৃতভাষায় কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। স্বামীজীও সংস্কৃতেই তাঁহাদিগকে উত্তর দিতে লাগিলেন। পন্ডিতেরা সকলেই প্রায় এক সঙ্গে চিৎকার করিয়া সংস্কৃতে স্বামীজীকে দার্শনিক কূট প্রশ্নসমূহ করিতেছিলেন, এবং স্বামীজী প্রশান্ত গম্ভিরভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে ঐ-বিষয়ক নিজ মীমাংসাদ্যোতক সিদ্ধান্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, স্বামীজীর সংস্কৃতভাষা পন্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুর ও সুললিত হইতেছিল; পন্ডিতগণও ঐ কথা পরে স্বীকার করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতভাষায় স্বামীজীকে ঐরূপ অনর্গল কথাবার্তা বলিতে দেখিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণও সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কারণ, গত ছয় বৎসর কাল ইওরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজী যে সংস্কৃত-আলোচনার তেমন সুবিধা পান নাই, তাহা সকলেরই জানা ছিল। শাস্ত্রদর্শী এই-সকল পন্ডিতের সঙ্গে ঐরূপ তর্কালাপে সেদিন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, স্বামীজীর মধ্যে অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। সেদিন ঐ সভায় রামকৃষ্ণানন্দ, শিবানন্দ, যোগানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও নির্মলানন্দ মহারাজগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাদে স্বামীজী সিদ্ধান্তপক্ষ এবঘ পন্ডিতগণ পূর্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। শিষ্যের মনে পড়ে, বিচারকালে স্বামীজী এক স্থলে 'অস্তি'-স্থলে 'স্বস্তি' প্রয়োগ করায় পন্ডিতগণ হাসিয়া উঠেন; তাহাতে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বলেন, 'পন্ডিতানাং দাসোহহং ক্ষন্তব্যমেতং স্খলনম্'। পন্ডিতেরাও স্বামীজীর এইরূপ দীন ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্যাপ্ত বলিয়া পন্ডিতগণ স্বীকার করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। দুই-চারি জন আগন্তুক ভদ্রলোক ঐ সময় তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়গণ, স্বামীজীকে কিরূপ বোধ হইল? তদুত্তরে বয়োজ্যেষ্ঠ পন্ডিত বলিলেন, ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও স্বামীজী শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদ্রষ্টা, মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয় এবং স্বীয় প্রতিভাবলে বাদখন্ডনে অদ্ভুত পান্ডিত্য দেখাইয়াছেন।

পন্ডিত চলিয়া গেলে স্বামীজী শিষ্যকে বলেন যে, পূর্বপক্ষকারী উক্ত পন্ডিতগণ পূর্বমীমাংসা-শাস্ত্রে সুপন্ডিত। স্বামীজী উত্তরমীমাংসা পক্ষ অবলম্বনে তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞানকান্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং পনডিতগণও তাঁহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্যাকরণগতঃ একটি ভুল ধরিয়া পন্ডিতগণ যে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীজী বলেন যে, অনেক বৎসর যাবৎ সংস্কৃতে কথাবার্তা না বলায় তাঁহার ঐরূপ ভ্রম হইয়াছিল। পন্ডিতগণের উপর সেজন্য তিনি কিছুমাত্র দোষারোপ করেন নাই। ঐ বিষয়ে স্বামীজী ইহাও কিন্তু বলিয়াছিলেন:

পাশ্চাত্যদেশে বাদের মূল বিষয় ছেড়ে ঐবাবে ভাষার সামান্য ভূল ধরা প্রতিপক্ষের পক্ষে মঃআ অসৌজন্য। সভ্যসমাজ ঐরূপ স্থলে ভাবটাই নেয় -- ভাষার দিকে লক্ষ্য করে না। তোদের দেশে কিন্তু খোসা নিয়েই মারামারি চলছে -- ভেতরকার শস্যের সন্ধান কেউ করে না।

পরে স্বামীজী শিষ্যের সঙ্গে সেদিন সংস্কৃতে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যও ভাঙা ভাঙা সংস্কৃতে জবাব দিতে লাগিল, তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐদিন হইতে শিষ্য স্বামীজীর অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেবভাষায় কথাবার্তা কহিত।

'সভ্যতা' কাহাকে বলে, ইহার উত্তরে সেদিন স্বামীজী বলেন:

যে সমাজ বা যে জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে যত অগ্রসর, সে সমাজ ও সে জাতি তত সভ্য। নানা কল-কারখানা করে ঐহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি করতে পারলেই যে জাতিবিশেষ সভ্য হয়েছে, তা বলা চলে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করে দিচ্ছে, পরন্তু ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সর্বসাধারণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা প্রদর্শন করে লোকের ঐহিক অভাব এককালে দূর করতে না পারলেও নিঃসন্দেহে অনেকটা কমাতে সমর্থ হয়েছিল। ইদানীন্তন কালে ঐ উভয় সভ্যতার একত্র সংযোগ করতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেছেন। একালে একদিকে যেমন লোককে কর্মতৎপর হতে হবে, অপেদিকে তাদের তেমনি গভীর অধ্যাত্মজ্ঞান করতে হবে। এরূপে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আন্যান্য-সংমিশ্রণে জগতে এক নবযুগের অভ্যুদয় হবে।

এ-কথা স্বামীজী সেদিন বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন; ঐ কথা বুঝাইতে বুঝাইতে একস্থলে বলিয়াছিলেন:

আর এক কথা -- ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে যত ধর্মপরায়ণ হবে, সে বাইরের চালচলনে তত গম্ভীর হবে, মুখে অন্য কথাটি থাকবে না। একদিকে আমার মুখে উদার ধর্মকথা শুনে ওদেশের ধর্মযাজকেরা যেমন অবাক হয়ে যেত, বক্তৃতার শেষে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখে আবার তেমনি অবাক হয়ে যেত। মুখের উপর কখনও কখনও বলেও ফেলত, 'স্বামীজী, আপনি একজন ধর্মযাজক; সাধারণ লোকের মতো এরূপ হাসি-তামাসা করা আপনার উচিত নয়। আপনার ও-রকম চপলতা শোভা পায় না'। তার উত্তরে আমি বলতাম, We are children of bliss -- why should we look morose and sobre (আমরা আনন্দের সন্তান, বিরস মুখে থাকব কেন)? ঐ কথা শুনে তারা মর্ম গ্রহণ করতে পারত কিনা সন্দেহ।

সেদিন স্বামীজী ভাবসমাধি ও নির্বিকল্প-সমাধি সম্বন্ধেও বলিয়াছিলেন:

মনে কর, একজন হনুমানের মতো ভক্তিভাবে ঈশ্বরের সাধনা করছে। ভাবের যত গাঢ়তা হতে থাকবে, ঐ সাধকের চলন-বলন ভাবভঙ্গী, এমন কি শারীরিক গঠনাদিও ঐরূপ হয়ে আসবে। 'জাত্যন্তরপরিণাম'[১] -- ঐরূপেই

[১] দ্রষ্টব্য: যোগসূত্র -- ৪।২

হয়। ঐরূপ একটা ভাব নিয়ে সাধক ক্রমে ‘তদাকারাকারিত’ হয়ে যায়। কোন প্রকার ভাবের চরমাবস্থার নামই ভাব-সমাধি। আর আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই -- এইরূপে ‘নেতি, নেতি’ করতে করতে জ্ঞানী সাধক চিন্মাত্রসত্তায় অবস্থিত হলে নির্বিকল্প-সমাধিলাভ হয়। এক-একটা ভাব নিয়েই সিদ্ধ হতে বা ঐ ভাবের চরমাবশথায় পৌঁছতে কত জন্মের চেষ্টা লাগে! ভাবরাজ্যের রাজা আমাদের ঠাকুর কিন্তু আঠারটি ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ভাবমুখে না থাকলে তাঁর শরীর থাকত না -- এ-কথাও ঠাকুর বলতেন।

কথায় কথায় শিষ্য ঐদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাশয়, ঐদেশে কিরূপ আহারাদি করিতেন? উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, ওদেশের মতোই খেতাম। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কিছুতেই জাত যায় না।

এদেশে কি প্রণালীতে কার্য করিবেন, সে সম্বন্ধে স্বামীজী ঐদিন বলেন:

মাদ্রাজ ও কলিকাতায় দুইটি কেন্দ্র করে সর্ববিধ লোক-কল্যাণের জন্য নূতন ধরনের সাধুসন্ন্যাসী তৈরি করতে হবে। Destruction (ধ্বংস) দ্বারা বা প্রাচীন রীতিগুলি অযথা ভেঙে সমাজ বা দেশের উন্নতি করা যায় না। সর্বকালে সর্বদিকে উন্নতিলাভ constructive process-এর (গঠনমূলক প্রণালী) দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীন রীতিগুলিকে নূতনভাবে পরিবর্তিত করেই গড়া হয়েছে। ভারতবর্ষের ধর্মপ্রচারকমাত্রই পূর্ব পূর্ব যুগে ঐভাবে কাজ করে গেছেন। একমাত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম destructive (ধ্বংসমূলক) ছিল। সেজন্য ঐ ধর্ম ভারত থেকে নির্মূল হয়ে গিয়েছে।

স্বামীজী ঐভাবে কথা কহিতে কহিতে বলিতে লাগিলেন:

একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মবিকাশ হলে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পেয়ে অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু -- এ কথা সর্বশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করেছে। সেজন্য সাধন করেও লোক এখন সিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারছে না। ধর্মের এ-সকল গ্লানি দূর করতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীর ধারণ করে বর্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত সার্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হলে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হবে। এমন অদ্ভুত মহাসমন্বয়াচার্য বহুশতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেননি।

স্বামীজীর একজন গুরুভ্রাতা এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ওদেশে সর্বদা সর্বসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করিলে না কেন?

স্বামীজী -- ওরা দর্শন-বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তিতর্ক-দর্শন-বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞানগরিমা চূর্ণ করে দিতে না পারলে কোন কিছু করা যায় না। তর্কে খেই হারিয়ে যারা যথার্থ তত্ত্বান্বেষী হয়ে আমার কাছে আসত, তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম। নতুবা একেবারে অবতারবাদের কথা বললে ওরা বলত, ও আর তুমি নতুন কি বলছ? আমাদের প্রভু ঈশাই তো রয়েছেন।

তিন-চারি ঘন্টা কাল ঐরূপ মহানন্দে অতিবাহিত করিয়া শিষ্য সেদিন অন্যান্য আগন্তুকদের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।